XXBE

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯১ বর্ষ ৩৪১ সংখ্যা বুধবার ১৫ ফাল্গুন ১৪১৯ কলকাতা

সাহস কিঞ্চিৎ কম

পবনকুমার বনশল প্রমাণ করিলেন, দীনেশ ত্রিবেদী ভারতীয় রেলের রোগ নির্ধারণে এবং বিশল্যকরণী প্রয়োগে অভ্রান্ত ছিলেন। যে রেল বাজেট পেশ করিবার ‘অপরাধে’ তিনি দলনেত্রীর কোপে পড়িয়াছিলেন, সেই বাজেটের নীতির অংশবিশেষ প্রয়োগ করিয়াই বনশল মাত্র কয়েক মাসে রেলের স্বাস্থ্য খানিক হইলেও ফিরাইতে পারিয়াছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন রেলের অপারেটিং রেশিয়ো অর্থাৎ, কার্যত, আয়ের অনুপাতে দৈনন্দিন ব্যয়ের মাত্রা দাঁড়াইয়াছিল ৯৫ শতাংশ। এই পাপ অবশ্য তাঁহার একার নহে, রেলমন্ত্রকে তাঁহার পূর্বসূরিরাও জনমোহনের খেলায় মাতিয়া এই অনুপাতটিকে পাকাপাকি ভাবে নব্বইয়ের ঘরে তুলিয়া দিয়াছিলেন। অধিকতর রাজনৈতিক ওজনসম্পন্ন রেলমন্ত্রীরা যে কাজটি ভুলিয়াও করেন নাই, ত্রিবেদী সেই কাজটি, অর্থাৎ যাত্রিভাড়া বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাহার পর ত্রিবেদী ‘ভ্যানিশ’, মুকুল রায়ের আবির্ভাব। বনশল রেলমন্ত্রী হইয়া সেই ভাড়াবৃদ্ধির সিদ্ধান্তটি আংশিক কার্যকর করিয়াছিলেন। তাহাতেই রেলের অপারেটিং রেশিয়ো কমিয়া ৮৮.৮ শতাংশে দাঁড়াইয়াছে। পরিষেবা যাঁহারা ব্যবহার করেন, তাঁহাদের নিকট পরিষেবার খরচ যথাসম্ভব আদায় করিতে হইবে, এই স্বাভাবিক নীতি প্রয়োগের সুফল ফলিয়াছে।

নূতন বছরের রেল বাজেট রচনার সময়েও বনশলের প্রধান দায়িত্ব ছিল সেই নীতিই অনুসরণ করা। তাঁহার একটি বাড়তি সুবিধাও ছিল; কেন্দ্রে জোট সরকারের চল হইবার পর এই প্রথম কোনও প্রধান শরিকের দলভুক্ত রেলমন্ত্রী বাজেট পেশ করিলেন। কোনও একটি রাজ্যের রেলমন্ত্রী হইবার দায় তাঁহার ছিল না। সর্বভারতীয় দলের রেলমন্ত্রীদের আপন রাজ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্বের নজিরও বিরল নয়, গনি খানচৌধুরী স্মরণীয়; কিন্তু সাম্প্রতিক কালে আঞ্চলিক শরিকদের হাতে রেল মন্ত্রক ছাড়িয়া রাখিবার কুফল রেলের সর্বাঙ্গে ছাপ ফেলিয়াছে। সেই ছাপ অপনয়নের দায়িত্ব বনশলের উপর ছিল। তাঁহাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ বলা যাইবে না। জানুয়ারি মাসের শেষে রেলের যে ভাড়া বাড়িয়াছিল, তাহার কল্যাণে আগামী অর্থবর্ষে রেলের বাড়তি ৬,৬০০ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান। অঙ্কটি বর্তমান অর্থবর্ষে যাত্রিভাড়া আদায়ের এক-পঞ্চমাংশের বেশি। কিন্তু ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল যাত্রিভাড়া বাড়ে নাই, নূতন বাজেটে আরও কিছুটা বাস্তববাদী হইবার সাহস রেলমন্ত্রীর কুলাইল না? তাঁহার যুক্তি, মাত্র এক মাস পূর্বে যাত্রিভাড়া বাড়াইয়াছেন, সেই কারণেই এই বাজেটে ক্ষমা দিয়াছেন। ভাল। কিন্তু তিনিই দেখাইয়াছেন, ভাড়া বাড়াইবার জন্য বাজেটের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। নির্বাচনের কথা না ভাবিয়া তিনি প্রয়োজন অনুসারে বছরের মধ্যপথে ভাড়া বাড়াইতে পারিবেন কি? সাহস হইবে?

দীনেশ ত্রিবেদীর ছায়াটি, বস্তুত, দীর্ঘতর। তিনি তাঁহার বৈপ্লবিক বাজেটে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ডিজেল বা বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির ফলে রেলের যে খরচ বাড়ে, তাহাকে আলাদা ভাবে ভাড়ার অন্তর্গত করা হউক। বনশল সেই প্রস্তাবটিকে বাস্তবায়িত করিয়াছেন। পূর্বসূরির সূত্র মানিয়াই বলিয়াছেন, জ্বালানির খরচ যে ভাবে বাড়িবে-কমিবে, রেলভাড়াও সেই অনুপাতে বাড়ুক-কমুক। বৎসরে দুই বার ভাড়া সংশোধন করা হইবে। ভাড়ার এই অংশটির নাম ফুয়েল অ্যাডজাস্টমেন্ট কমপোনেন্ট (এফ এ সি)। আপাতত শুধু পণ্য মাসুলের ক্ষেত্রেই এফ এ সি প্রযোজ্য হইবে। সিদ্ধান্তটি এক অর্থে বৈপ্লবিক। রেল ভাড়াকে বাজার ব্যবস্থার আওতায় লইয়া আসিবার কোনও উদ্যোগ ইহার পূর্বে হয় নাই। অর্থনীতির দাবি, অদূর ভবিষ্যতে যাত্রিভাড়ার ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থাটি অনুসৃত হইবে। ডিজেলের দাম যাহাতে আন্তর্জাতিক বাজারের সহিত ওঠানামা করে, কেন্দ্রীয় সরকার তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। পরিবহণের খরচও এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই বাজার-অনুসারী হওয়া জরুরি। বিমানভাড়া যেমন চাহিদা-জোগানের অঙ্ক মানিয়া বাড়ে-কমে, রেলের যাত্রিভাড়ার ক্ষেত্রেও তাহা হইবে না কেন? রেলের স্বার্থেই এই ধরনের সংস্কারমুখী সিদ্ধান্ত জরুরি। বুদ্ধিবিবেচনারহিত সস্তা জনমনোরঞ্জনের পথে চলিয়া রেলের উন্নয়ন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়াছে। রেলমন্ত্রী সেই সর্বনাশের পথে আর অগ্রসর হন নাই, ভাল। কিন্তু এখনও সাহসের অভাব কেন?

বিপজ্জনক বাহানা

ইতিহাস, তথা ‘ইতি হ আস’, অতীতের বস্তু। বর্তমানের নহে। কথাটি বলিতে সহজ হইলেও বুঝিতে কঠিন। অন্তত ভারতীয়দের পক্ষে। তাহারা বারংবার ইতিহাসকে অকারণ বর্তমান কালের মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করে, বর্তমানের দুঃখ-দুর্দশার বাস্তব হইতে পলায়ন করিয়া ইতিহাসের কোলের মধ্যে নিজের বিড়ম্বিত মুখটি লুকাইতে চায়। ভুলিয়া যায় যে, ইতিহাস বেচারির কোলখানি প্রশস্ত হইলেও দুঃখ-উপশমকারী ক্ষমতা তাহার নাই। দীর্ঘ যুগব্যাপী সংঘটিত কোনও অন্যায়ের ক্ষতে হয়তো-বা সে তাহার মলিন আঁচলটি বুলাইয়া কিছু প্রতিকার করিলেও করিতে পারে, কিন্তু নানাবিধ একক ঘটনাকে আলাদা করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তাহার কাছে সুবিচারের আশায় দৌড়াইলে সে আশা পূরণ তাহার ক্ষমতায় কুলাইবে না। দেখা যায়, ব্রিটিশ রাজপুরুষরা ভারতে পা দিলেই, ভারতীয়রা নিজেদের শত গ্লানি ভুলিতে প্রাণপণে ইতিহাস আঁকড়াইয়া ঘ্যানঘ্যান করিতেছেন। ঘটনা হইল, ব্রিটিশরা ভারত নামক উপনিবেশটির যে অগণিত সামাজিক বা অর্থনৈতিক হেনস্থার কারণ হইয়াছে, তাহার প্রতিকার হিসাবে ব্রিটেন আজ সুমিত্রতার হাত বাড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু দুইশত বৎসরব্যাপী অসংখ্য সাম্রাজ্যবাদী অনাচারের প্রতিটির জন্য ক্ষমাস্বীকার কিংবা ক্ষতিপূরণ সে করিবে না।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ভারত সফরকালে পঞ্জাবে আসিয়া জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিতে ‘দুঃখপ্রকাশ’ করিলেন। অমনি হইহই উঠিল: ক্ষমাস্বীকার নহে কেন? হে ভারতবাসী, ক্যামেরন ভদ্র, তাই তিনি এইটুকু করিয়াছেন। এইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। অধিক দিন নহে, রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের স্বামী প্রিন্স ফিলিপ ভদ্রতার ধার ধারিতেন না বলিয়া সপাটে কহিয়া দিয়াছিলেন, ওই ঘটনার ‘রিপোর্টিং’ ভুল, নিশ্চিত ভাবেই অত লোক সে দিন নিহত হন নাই! হে ভারতবাসী, কেবল জালিয়ানওয়ালাবাগ-ই তো নহে, আরও অসংখ্য হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশ রাজের বদান্যতায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের কয়েকটির গুরুত্ব জালিয়ানওয়ালাবাগের অপেক্ষা বেশি বই কম নহে! ভগত সিংহ নামক জাতীয়তাবাদী যুবাটিকে ফাঁসি দিয়াও ব্রিটিশরা সুকাজ করে নাই। কত দুঃখ-ই বা প্রকাশ করিবেন ক্যামেরন! হিন্দুস্থানের মাটিতে পা দেওয়া ইস্তক যদি ব্রিটিশের যাবতীয় কুকার্যের জন্য তাঁহাকে একাই দুঃখ-বার্তা বিতরণ করিয়া যাইতে হয়, তবে তো ২০১৩-উপযোগী ব্যবসাবাণিজ্য-কথার আর সময়ই থাকে না!

আর, হে ভারতবাসী, ক্ষমাস্বীকারের কেঁচো খোঁড়াও কি সুবুদ্ধির কাজ? এগারো বছর পূর্বের গুজরাতের গণনিধন, ঊনত্রিশ বছর পূর্বের শিখ-নিধন, কিংবা সাড়ে পাঁচশো বছর পূর্বের মন্দির-লুণ্ঠন, কিংবা হাজার বৎসর পূর্বের লাগাতার বৌদ্ধভিক্ষু-নিধন, কোনও খাতার হিসাবই তো অদ্যাবধি মিলে নাই! বাস্তবিক, ভারতবর্ষের ইতিহাসের যা গতিপ্রকৃতি, তাহাতে প্রতিটি নাগরিকেরই উচিত অপর নাগরিকের সামনে আসিলে লজ্জায় অধোবদন হওয়া। বহু শতকের পাপের সে ভার এমনই বিপুল যে, বদন আদৌ না তোলাই সঙ্গত। ইতিহাস বড় বিপজ্জনক বস্তু।

শিল্প নেই, তাই বিকল্প কম, তাই মানুষ জমি আঁকড়ে আছেন, তাই শিল্প হচ্ছে না

এটাই পশ্চিমবঙ্গের কঠোর বাস্তব। এই বিষচক্র থেকে তাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্য সরকারকেই। একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক **মৈত্রীশ ঘটক**। *প্রথম পর্ব।*

সম্প্রতি একটি আলোচনাসভায় আপনি বলেছেন, অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জমির দাম বাড়লে হয়তো আগের চেয়েও কম জমি পাওয়া যাবে। এই কথাটা রীতিমত অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

আমি বলছি এই রকম সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এমন নয় যে দাম বাড়ালে সব সময়ই জোগান কমবে। আসলে এই কথাটি জমির বাজার নিয়ে একটা বৃহত্তর বক্তব্যের একটা অংশ। জমির বাজার ঠিক আর পাঁচটা বাজারের মতো নয় যে ‘ফেলো কড়ি, মাখো তেল এবং তেল না পেলে আরও কড়ি ফেলো’— এই সরল যুক্তিতে চলে। সিঙ্গুরে যখন শেষ পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়াটি ভেস্তে গেল, আমি এবং আর কয়েক জন অর্থনীতিবিদ সেখানে একটা সমীক্ষা করেছিলাম। আমরা দেখার চেষ্টা করেছিলাম, কত দাম পেলে মানুষ জমি বেচে দিতে রাজি হবেন। আমরা যখন সিঙ্গুরে কৃষিজীবী মানুষের সঙ্গে কথা বলি, জমির চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটা কথা স্পষ্ট হয়েছিল। জমি শুধুমাত্র একটা প্রডাকটিভ অ্যাসেট অর্থাৎ উৎপাদনশীল সম্পদ নয়। জমি বড় ধরনের আর্থিক নিরাপত্তা। সোনা থাকলে চুরি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু জমি চুরি যাওয়া কঠিন। আমাদের এখানে জমির বাজার যে রকম ঘেঁটে আছে, তাতে দুম করে জমির মালিকানা পাল্টে ফেলাও কঠিন। জমির যা দাম, জমি বেচে দিয়ে যদি তার চেয়ে অনেক বেশি টাকাও পাওয়া যায়, সেই টাকা হাতে রাখার অনেক রকম মুশকিল আছে। ছেলে বাইক কিনবে, অন্য ভাবেও টাকা বাজে খরচ হয়ে যাবে। মূল্যস্ফীতির সমস্যা আছে। জমি যাকে বলে ইনফ্লেশন-প্রুফ অ্যাসেট। আর একটা বড় ব্যাপার হল, জমি থেকে খাদ্য উৎপন্ন হয়। শুধু ভারতেই নয়, গোটা দুনিয়াতেই যাঁরা মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল, এবং একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে বসবাস করেন— তাঁদের মধ্যে বাইরের বৃহত্তর দুনিয়া সম্বন্ধে এক ধরনের অবিশ্বাস কাজ করে। নিজের খাবারের ব্যবস্থাটুকু নিজের হাতে করে নিতে পারা তাঁদের কাছে বড় নিরাপত্তা। জমি নিজেও একটা বড় নিরাপত্তা— মানুষ জানেন, বিপদে পড়লে, চিকিৎসার জন্য, ছেলেমেয়ের লেখাপড়া বা বিয়ের জন্য জমি বেচে টাকা পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা সেই কারণেও জমি হাতে রাখতে চেষ্টা করেন।

সমীক্ষায় পাওয়া তথ্যের ওপর নির্ভর করে আমরা একটা মডেল তৈরি করেছি। তার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণের মধ্যে এখানে যাচ্ছি না। মূল কথাটা বলি। জমির ব্যবহারকে দুটো ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়— এক, রোজগারের জন্য; দুই, নানান নিরাপত্তার জন্য। জমির দাম যত কম হবে, নিরাপত্তার জন্য তত বেশি জমি হাতে রাখতে হবে— কম দামে বেচলে প্রয়োজনীয় টাকা তোলার জন্য বেশি জমি বেচতে হবে, তাই। যাঁরা নিতান্ত গরিব, তাঁরা বাজারে জমির দাম কম থাকলে এই দ্বিতীয় ব্যবহারের জন্য জমি হাতে রাখতেই পারেন না। এমনকী, মাঝারি চাষিরাও পারেন না। ফলে, যতটুকু জমিতে তাঁরা চাষ করেন, ততটুকুই তাঁরা হাতে রাখেন। এ বার, জমির দাম যত বাড়বে, তত অল্প জমিতেও নিরাপত্তার কাজ হবে। ফলে, অনেকের পক্ষেই ‘নিরাপত্তার জমি’ ধরে রাখা সম্ভব হবে। খেয়াল করার, জমির যত দাম বাড়বে, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কৃষকের পক্ষেও জমি ধরে রাখা সম্ভব হবে। ফলে, জমির দাম বাড়লে জোগান কমতেই পারে। অর্থনীতির ভাষায়, জমির সাপ্লাই কার্ভ দামের একটা পরিসরের ক্ষেত্রে ব্যাকওয়ার্ড বেন্ডিং।

এখন যাঁরা ধনী কৃষক, অর্থাৎ যাঁদের হাতে এখনই বিক্রি করার মতো জমি আছে, জমির দাম বাড়লে নিরাপত্তার জন্য তাঁদের তো আরও কম জমি হাতে রাখলেই চলে। তাঁরা কি নিজেদের উদ্বৃত্ত জমি বেচে দেবেন না? তাতে জমির জোগান বাড়বে না কি?

যাঁরা ধনী কৃষক এবং যাঁদের হাতে বিক্রি করার জন্যে এখনই উদ্বৃত্ত জমি আছে, জমির দাম বাড়লে তাঁদের দিক থেকে জমির জোগান বাড়বে, প্রথাগত অর্থনীতির যুক্তিতেই। কিন্তু নীট ফল কী হবে তা জমির মোট পরিমাণ দিয়ে নির্ধারিত হবে না, জমির বণ্টনের ওপর নির্ভর করবে। পশ্চিমবঙ্গের সীমিত ভূমিসংস্কার এবং জমিতে জনসংখ্যার চাপ, এই দুই কারণের ফলে ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা বেশি, তাই জমির জোগান কম হওয়া এবং দাম বাড়লে সমস্যার সমাধান না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আমাদের সমীক্ষার নমুনায় দেখছি, জমি বেচার সিদ্ধান্ত তিনটে বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এক, যে পরিবারের হাতে জমির পরিমাণ যত কম, জমি বেচায় তারা তত বেশি অনিচ্ছুক। দুই, যে পরিবারের সদস্যরা মূলত কৃষিক্ষেত্রেই কাজ করেন, অর্থাৎ যে পরিবার কৃষির ওপর যত বেশি নির্ভরশীল, তাঁরা জমি বেচতে তত বেশি অনিচ্ছুক। তিন, কমবয়সিরা জমি বেচতে অপেক্ষাকৃত ভাবে বেশি ইচ্ছুক। প্রথমটা কেন হয়, তার কারণ আগেই বললাম। দ্বিতীয় ঘটনাটি কেন ঘটে, অর্থাৎ মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল পরিবার জমি বেচতে কেন অনিচ্ছুক? কারণ কৃষিই তাঁদের একমাত্র মানবসম্পদ। ভেবে দেখলে, কেউ যদি আমায় বলে যে অনেক টাকা দেব কিন্তু তুমি আর কোনও দিন বই পড়তে পারবে না, লিখতে পারবে না, কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে না— আমি কি সেই অনেক টাকার বিনিময়ে এই জিনিসগুলো ছেড়ে দেব? আমার ক্ষেত্রে বই, কম্পিউটার যা, কিছু কৃষিজীবী পরিবারের ক্ষেত্রে জমি ঠিক তাই— আমরা সারা জীবন ধরে শুধু এই জিনিসগুলোই ব্যবহার করতে শিখেছি। যাঁদের বয়স কম, খানিক পড়াশোনা আছে এবং কৃষির বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা কম— তাঁরা বিকল্প পেশার কথা ভাবতে পারেন।

কমবয়সিরা অপেক্ষাকৃত সহজে জমি বেচতে রাজি হবেন, এটা তো খানিকটা প্রত্যাশিতই। এবং, সম্ভবত ভাল খবরও বটে।

হ্যাঁ, কিন্তু তরুণ প্রজন্মের সামনে যদি আরও বেশি বিকল্পের রাস্তা খোলা থাকত, তা হলে তাঁরা আরও কম জমি আঁকড়ে থাকতে চাইতেন। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যদি তরুণরা দেখতেন যে তাঁদেরই মতো ছেলেমেয়েরা, তাঁদের বন্ধুবান্ধবরা কোনও প্রশিক্ষণ নিয়ে ভাল চাকরি পেয়েছে, চাষ করার চেয়ে ভাল ভাবে আছে, তবে তাঁরা অনেক বেশি করে সেই পেশায় যেতে চাইতেন। পশ্চিমবঙ্গে সেই সুযোগ, দুর্ভাগ্যজনক ভাবে, নেই। এখানে একটা বিষচক্র কাজ করছে— শিল্প হচ্ছে না বলে বিকল্প কম, বিকল্প কম বলে জমির ওপর নির্ভরতা প্রবল, আর তাই শিল্প হচ্ছে না।

এই ক্ষেত্রে তো সরকারের দায়িত্ব অনেকটাই। যেমন, এই ছেলেমেয়েদের জন্য চাকরির বিশ্বাসযোগ্য বিকল্প তৈরি করা, যাঁদের জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে, তাঁদের জন্য স্বাস্থ্য বিমার ব্যবস্থা করা... হয়তো এমন একটা ব্যবস্থাও করা যায়, যেখানে জমি দিলে একটা পরিচয়পত্র পাওয়া যাবে, যেটা থাকলে ব্যাঙ্ক বিনা বন্ধকে ঋণ দেবে। সেই ঋণের জামিন থাকবে সরকার।

সে তো বটেই। সরকারের দায়িত্ব একেবারেই অপরিহার্য। আর পাঁচ জন ভবিষ্যৎ দেখতে পায় না। কিন্তু সরকার পায়, অন্তত পাওয়ার কথা। এবং, ভবিষ্যতের থেকে ঋণ নিয়ে আজকে খরচ করার অধিকার একমাত্র সরকারেরই আছে। কাজেই, সরকারের স্যোশাল আরবিট্রেটরের ভূমিকা নেওয়ার কথা। যে ব্যবস্থাগুলো করলে মানুষ জমি ছাড়তে স্বচ্ছন্দ হবেন, সেগুলো সরকারকে করতে হবে। রাজকোষের টাকা খরচ করেই। শিল্প হলে সেই টাকা পুষিয়ে যাবে। কিন্তু তার জন্য এক দিকে রাজকোষে টাকা থাকতে হবে, অন্য দিকে— সরকারের খানিক সদিচ্ছাও থাকতে হবে। *(চলবে)*

যদি তরুণরা দেখতেন যে তাঁদেরই মতো ছেলেমেয়েরা কোনও প্রশিক্ষণ নিয়ে ভাল চাকরি পেয়েছে, চাষ করার চেয়ে ভাল ভাবে আছে, তবে তাঁরাও সেই পেশায় যেতে চাইতেন।

সাক্ষাৎকার: অমিতাভ গুপ্ত

রাজনীতি, পুলিশ, প্রশাসন, এবং গুন্ডারা

তাপস সিংহ

সংখ্যালঘু নিধন, দলীয় সংঘর্ষ, অন্য ধরনের সংঘাত— হিংসার সমিধ সরবরাহ করে চলে অশুভ ‘বেরাদরি’। কখনও দূরের রাজ্যে, কখনও ঘরের কাছে। গোধরার পরে এগারো বছর কেটে গেল। দুষ্টচক্রগুলি যথাপূর্বম্।

আজ ২৭ ফেব্রুয়ারি। না, দু’হাত জোড় করে সর্বগ্রাসী আতঙ্ক মাখা সেই কুতুবুদ্দিন আনসারিকে নিশ্চয় আজ আর দেখা যাবে না। কিন্তু ২০০২-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিটি বছরের এই দিনটিতে কুতুবুদ্দিন আনসারিদের সেই অতলান্ত আতঙ্কের দুঃসহ স্মৃতি ফিরে ফিরে আসবেই।

২০০২-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসের কামরায় জীবন্ত দগ্ধ ৫৮ জনের কথা, তার ‘প্রতিক্রিয়ায়’ গুজরাত জুড়ে সংখ্যালঘু নিধনের কথা, সেই হত্যালীলা ছাপিয়ে কুতুবুদ্দিনদের কথা প্রায় সকলেরই জানা। বরং আজ, সবরমতী এক্সপ্রেসের সেই পোড়া কামরা ভেদ করে যদি আর একটু গভীরে নজর ফেরাই? যদি দেখার চেষ্টা করি, কী ভাবে হিংসার বীজ বপন হয়? সেই বপনকালে কী ভাবেই বা শামিল হন রাজনীতিক, পুলিশ আর প্রশাসন?

এই সন্ধানে আমরা ওয়ার্ড বেরেনস্কট-এর সাহায্য নেব। তিনি গবেষক, কাজ করেন হল্যান্ডে। দীর্ঘ দিন ধরে গুজরাত ‘দাঙ্গা’র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যকারণের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছেন বহু খুঁটিনাটি বিষয়, চমকপ্রদ নানা ঘটনা, যার অনেকগুলিই আমাদের পরিচিত মনে হয়।

আমদাবাদের কাছে একটি ছোট শহর। সেখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দশ বছরের এক বালককে প্রতিবেশীর রুপোর গয়না চুরির অভিযোগে পুলিশ ধরে। তার ঠাকুমাকে পুলিশ বলে, ২৫ হাজার টাকা দিলে তারা তাঁর নাতিকে বাঁচিয়ে দেবে। বৃদ্ধা প্রথমে রাজি হলেও পরে পিছিয়ে আসেন। ক্ষুব্ধ পুলিশকর্মীরা তাঁকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মেরে বেশ কয়েকটি হাড় ভেঙে দেয়। মারের চিহ্ন বাইরে থেকেও বোঝা যাচ্ছিল। বিপাকে পড়ে পুলিশ তাঁর বদলে অন্য এক বৃদ্ধাকে কোর্টে হাজির করে। অভিযুক্ত বালকের ঠাকুমাকে বসিয়ে রাখা হয় কোর্টের বাইরে পুলিশ ভ্যানে।

এই সময়েই চিত্রনাট্যে পুরসভার কাউন্সিলর, স্থানীয় কংগ্রেস নেতার প্রবেশ। স্থানীয় এক ‘গুন্ডা’র আত্মীয় ওই বৃদ্ধা। নির্বাচনের তিন বছর পরে সেই বাহুবলীর ফোন নেতাকে। সেই নির্বাচনের দিন সে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা, ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে গন্ডগোল বাঁধিয়েছিল। যদিও ওই নেতারই হস্তক্ষেপে ওই বৃদ্ধার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয়।

বৃদ্ধাকে নিয়ে নেতা থানায় যান অভিযুক্ত পুলিশের বিরুদ্ধে এফ আই আর করতে। পুলিশ প্রথমে সহকর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিতে চায়নি। পরে ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারের কথায় তা নেওয়া হয়। খবর পায় মিডিয়াও। প্রচার চলে। সাসপেন্ড হতে বসেন অভিযুক্ত সাব ইনস্পেক্টর। তবে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় থাকায় তাঁকে সাসপেন্ড না করে তড়িঘড়ি বদলি করে দেওয়া হয়। চিকিৎসার পরে ওই বৃদ্ধা সুস্থ হয়ে ওঠেন। ঘটনা সেখানেই মিটে যায়। অন্তত, ওই নেতা তাই ভেবেছিলেন।

এর কয়েক মাস পরে ওই কংগ্রেস নেতার সঙ্গে বিমানবন্দরে ওই পুলিশ অফিসারের দেখা। তিনি প্রশ্ন করেন, ‘চিনতে পারেন? আমার সাসপেনশনের জন্য আপনি অনেক চেষ্টা করেছিলেন?’ নেতার মনে পড়ে যায় সে কথা। ওই অফিসার তাঁকে জানান, স্থানীয় আর এক কংগ্রেস নেতা এবং সেই বাহুবলীই তাঁর হয়ে ‘ব্যবস্থা’ করেছেন। তাঁকে নিয়ে ওই বৃদ্ধার কাছে গিয়েছেন। সব কিছু ‘ম্যানেজ’ হওয়ায় তাঁকে সাসপেন্ড না করে স্রেফ বদলি করা হয়েছে।

বেরেনস্কটের কাছে কংগ্রেসের ওই নেতা নিজেই এই কাহিনি শুনিয়েছেন। এ ব্যাপারে বেশ মোটা অঙ্কের লেনদেন হয়েছে বলে তিনি মনে করেন এবং নিজেকে বঞ্চিত বলে ভাবছেন তিনি! কারণ, তিনিই সব কিছু করেছেন, আর ওই বৃদ্ধা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরের এত সব ঘটনা তিনিই জানতে পারলেন না!

এ এক জটিল সমীকরণ— স্থানীয় রাজনীতিক, গুন্ডা আর পুলিশ-প্রশাসনের! ছবিটা খুবই পরিচিত। নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ দূরে সরিয়ে রেখে এ ভাবেই তো রাজনীতিক-দুষ্কৃতী আর প্রশাসন পরস্পরের কাছাকাছি আসেন!

ওই এলাকারই আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন বেরেনস্কট। এটিও গোধরা-পরবর্তী ঘটনা। মুখ্য চরিত্র এক স্থানীয় গুন্ডা (লেখক বলছেন, ‘গুন্ডা’র কোনও ভাল প্রতিশব্দ হয় না)। সেই গুন্ডাটি এলাকায় মদ সরবরাহ করতেন, গুজরাতে যা নিষিদ্ধ। ২০০২-এ গুজরাতে বিধানসভা নির্বাচনের দিন তিনি স্থানীয় বিধায়কের হয়ে একটি পোলিং বুথ দখল করেন। বেরেনস্কটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, নির্বাচনী প্রচারের জন্য বিধায়ককে তিনি অনেক টাকাও দিয়েছেন। কারণ, তিনি জানতেন, জিতলে নিজের মদের ব্যবসায় তাঁর সাহায্য পাবেন। কথা রেখেছিলেন বিধায়ক। নির্বাচনে জেতার পরে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন ওই গুন্ডাকে। একাধিক বার।

বেরেনস্কট গুন্ডাটিকে প্রশ্ন করেছিলেন, বিধায়কের কথা পুলিশ শুনল কেন? সাফ উত্তর: ‘কারণ, না শুনলে ওই অফিসার অন্য জায়গায় বদলি হয়ে যাবেন।’ প্রসঙ্গত, ওই জায়গাটিতে পোস্টিংয়ের জন্য বিধায়ককে ওই অফিসারও প্রচুর টাকা দিয়েছিলেন!

ওখান থেকে একটু বাইরে আর একটি অঞ্চল। সেখানে কিছু হিন্দু পরিবার থাকলেও সংখ্যালঘুদের সংখ্যাই বেশি। দাঙ্গার সময় এখানেও সেই বিধায়কের উপস্থিতির কথা জানিয়েছেন বেরেনস্কট। কী ভাবে? ২০০২-এর ১ মার্চ ওই অঞ্চলে জড়ো হয় প্রায় দু’হাজার মানুষের জনতা। সেই ভিড়ে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের স্থানীয় নেতারাও ছিলেন। আরও ছিল স্থানীয় দুষ্কৃতীরাও। অনেকেরই মাথায় গেরুয়ারঙা ফেট্টি ছিল। হাতে ছিল তরোয়াল, ত্রিশূল আর প্লাস্টিকের বোতলে পেট্রল। বস্তির দিকে সেই উন্মত্ত জনতা এগোচ্ছিল। এই সময়েই জিপ নিয়ে এক পুলিশ অফিসার সেখানে হাজির হন। না, জনতাকে ঠেকাতে নয়, বরং তাঁর জিপের পেট্রলই দাঙ্গাকারীদের বোতলে ভরা হচ্ছিল। গোটা বসতি জ্বলে খাক হয়ে যায়।

এই ঘটনার পরে, স্থানীয় এক সমাজকর্মী বেশ কয়েক বার ব্যর্থ হওয়ার পর কোনও মতে থানায় এফ আই আর করতে সমর্থ হন। সেখানে পুলিশের ওই সাব ইনস্পেক্টরের নাম করে তিনি লেখেন, ওই অফিসার পেট্রল বিলি করেছেন। দাঙ্গাকারীদের ধরার পরিবর্তে পুলিশ উল্টে ওখানকার ১২-১৫ জন দরিদ্র মানুষকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। ওই সমাজকর্মীর অভিযোগ ছিল, বিধায়ক পেট্রল বিলিতে সাহায্য করেছেন এবং দাঙ্গায় মদত দিয়েছেন। কারণ, ওখানকার বাসিন্দারা তাঁকে ভোট দেন না বলে তাঁর রাগ ছিল। সেখানে নতুন একটি কলোনি করার জন্য প্রায় পাঁচ বছর আগে থেকেই তাঁর পরিকল্পনা ছিল।

বেরেনস্কট তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার সাহায্যে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, কী ভাবে রাজনীতি, প্রশাসন আর দুষ্কৃতীরা হাতে হাত মিলিয়ে একাকার হয়ে যায়। কি সংখ্যালঘু নিধন, কি দলীয় সংঘর্ষ, কি অন্য ধরনের সংঘাত— বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে সেই ‘বেরাদরি’ হিংসার সমিধ সরবরাহ করে। আমরা এই দুরাচারকে চিনি। হাড়ে হাড়ে চিনি। যখন ঘরের কাছে কলেজ নির্বাচনে হিংসার বলি হন পুলিশকর্মী, যখন কান কেটে, চোখ কার্যত উপড়ে নিয়ে ‘সবক’ শেখাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তের গন্ধ পাওয়া জনতা, তখন দেখতে পাই এই দুষ্টচক্রের ভয়ঙ্কর রূপ।

আমরা এই দুরাচারকে হাড়ে হাড়ে চিনি। ঘরের কাছে কলেজ নির্বাচনে হিংসার বলি হন পুলিশকর্মী, যখন কান কেটে, চোখ উপড়ে নিয়ে ‘সবক’ শেখাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তের গন্ধ পাওয়া জনতা।

রায়ট পলিটিক্স, ওয়ার্ড বেরেনস্কট। রেনলাইট/রূপা

সম্পাদক সমীপেষু

যত দোষ কেবল পথচারীর?

নতুন পুলিশ কমিশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর এটি প্রথম ‘পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ’। প্রসঙ্গত, গত সাত বছর ধরে, একটি ভিডিয়ো ক্যামেরা সম্বল করে (সৌজন্য তথ্যচিত্রকার দেবলীনা) কলকাতার বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে গিয়ে আমরা সিগনাল, জেব্রা ক্রসিং-সহ রাস্তার পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করি। কেন পথচারী ‘সিগনাল না-মেনে’ রাস্তা পার হতে বাধ্য হন। কেনই বা জেব্রা ক্রসিং থাকতে তা ব্যবহার করতে পারেন না। এ সব কিছুই ক্যামেরায় আমরা বন্দি করেছিলাম। তার পর সেই ছবিকে বিশ্লেষণ করে ২০০৬ সালে আনন্দবাজারে একটি উত্তর-সম্পাদকীয় লিখেছিলাম। যার সমর্থনে পাঠকদের বেশ কিছু চিঠি আসে এবং ‘সম্পাদক সমীপেষু’-তে সেই চিঠিগুলো ছাপিয়ে শিরোনাম দেওয়া হয়— ‘আপনার নিরাপত্তা আপনার মাথাব্যথা, ট্রাফিক পুলিশের নয়’। আমরা কলকাতা পুলিশ কমিশনার ও রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবকে রেজিস্ট্রি করে চিঠি পাঠাই পথ-নৈরাজ্যের বিষয়টি জানিয়ে। উত্তর পাঠানো তো দূরের কথা, চিঠির প্রাপ্তি-স্বীকারসূচক কোনও চিঠিও পাইনি। তার পর একের পর এক চিঠি লিখে যাই ‘সম্পাদক সমীপেষু’ বিভাগে। তৎকালীন নগরপাল গৌতমমোহন চক্রবর্তী একটি চিঠির উত্তরও দেন এই বিভাগে। যদিও কাজের কাজ কিছুই হয় না। এর পর ‘পরিবর্তনে’র সরকার ১০০ দিন পূর্ণ করার সময়ে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে কলকাতার বাইরে। সেই দুর্ঘটনায় একটি বাসের মধ্যে আগুন লেগে গেলে নাবালিকা ও তার মা-সহ চার জন ঝলসে পুড়ে মারা যান। এই ঘটনাটি ঘটার পর নতুন সরকারকে আমাদের সঙ্গে বসার অনুরোধ করি পথ-দুর্ঘটনা মোকাবিলার জন্য। কোনও লাভ হয় না।

এ দিকে পুলিশ অফিসাররা যথারীতি পথ-দুর্ঘটনার জন্য পথচারীদের দায়ী করতে শুরু করেছেন। আবার ‘হানি বানি...’ সুরে জেব্রা ক্রসিংয়ের ওপর ‘নিয়ম মেনে’ হাঁটতে থাকা বিটল্‌সদের ছবি দেখিয়ে পথচারীদের ‘সচেতন’ করতে চাইছেন। এবং একই সঙ্গে ‘জে ওয়াকার’ বা স্বেচ্ছাচারী পথচারীদের সবক শেখাতেও চাইছেন। অথচ আমরা প্রমাণ করে ছেড়েছি, এক দঙ্গল পুলিশের চোখের সামনে কী রকম জেব্রা ক্রসিংয়ের ওপরেই গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে, আর পথচারী কী ভাবে ‘গাড়িঘোড়ার ফাঁক’ দিয়ে বিপন্ন ভাবে রাস্তা পার হতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয়, বিশ্বের যে-কোনও জায়গায় যা ঘটে, জেব্রা ক্রসিংয়ে পা-রাখা মাত্রই দূর থেকে ছুটে-আসা গাড়ি তার গতি কমিয়ে দেয়, তা কিন্তু এখানে আদৌ ঘটে না। আমাদের একবার এক গাড়িচালক বলেছিলেন, আমাদের এই নিয়ে কোনও ট্রেনিং দেওয়া হয় না। এমনকী লাইসেন্স পাওয়ার সময়েও জেব্রা ক্রসিং ব্যাপারটাকে আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আর সিগনাল? যত কম বলা যায় ততই ভাল। পথচারীদের জন্য বিশাল চওড়া রাস্তা পার হওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও মাত্র চার সেকেন্ড, কোথাও বা মাত্র এক সেকেন্ড সবুজ থাকে। এমনকী কোথাও কোথাও একই সঙ্গে পথচারী ও গাড়ির সিগনাল সবুজ থাকে (চাইলে প্রমাণ দিতে পারি)।

এই ক’দিন আগে, ২০০৫ সালের পর আবার কলকাতায় বাসে-বাসে রেষারেষিতে এক যাত্রীর হাত কেটে গিয়ে রাস্তায় পড়ে। অথচ, কমিশন প্রথা এখনও চলছে রমরমিয়ে। আর হ্যাঁ, রাস্তায় গাড়িতে-গাড়িতে রেষারেষি বন্ধ করার জন্য বাসে ‘স্পিড গভর্নর’ বসানোর প্রস্তাবটি আজ অবধি মহাকরণের ঠান্ডা ঘরে পড়ে রয়েছে।

সবুজ মুখোপাধ্যায়। পথ দুর্ঘটনা প্রতিরোধ মঞ্চ, কলকাতা-৩৯

কটাক্ষ করা সমীচীন হয়নি

■ পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ‘স্বামীজির জন্মোৎসব’ (২৮-১)-এর পরিপ্রেক্ষিতে জানাই, অভিনেতা দেব বিবেকানন্দ সেজেছিলেন এটা নিয়ে কটাক্ষ করাটা সমীচীন হয়নি। দেব হলেন অভিনেতা। অভিনয় তাঁর পেশা। পরিচালক, নির্দেশক যেমন ভাবে বলেন, তিনি তেমন ভাবেই অভিনয় করার চেষ্টা করেন। তাঁকে কোনও মহামানবের ভূমিকায় অভিনয় করতে বললেও করবেন। সিনেমায় যা করেন, তা কিন্তু ওঁর জীবন নয়।

পরেশকুমার নন্দ। কলকাতা-৫৪

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
৯১ বর্ষ ৩৪২ সংখ্যা বৃহস্পতিবার ১৬ ফাল্গুন ১৪১৯ কলকাতা

শুদ্ধির সংকেত

ভারতীয় অর্থনীতির পিঠটি যে প্রবাদোক্ত দেওয়ালে ঠেকিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজকোষ ঘাটতির হার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৫.৩ শতাংশ, চলতি খাতে (আমদানি ও রফতানির ব্যবধানজনিত) ঘাটতি অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪.৬ শতাংশ। ভোগ্যপণ্য সূচকের নিরিখে মূল্যস্ফীতির হার এখনও দশ শতাংশের নীচে নামে নাই। অন্য দিকে, আর্থিক বৃদ্ধির হার সব আশঙ্কাকে ছাপাইয়া মাত্র পাঁচ শতাংশে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তবে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকিলে ঘুরিয়া দাঁড়ানোই একমাত্র পথ, এই চলতি বিশ্বাসটি কত ভাগ খাঁটি— অন্তত ভারতীয় অর্থনীতির অভিভাবকদের ক্ষেত্রে— তাহা আজ সকাল এগারোটায় প্রমাণ হইবে। গতকাল প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষার পৃষ্ঠায় ঘুরিয়া দাঁড়াইবার কিছু ইঙ্গিত রহিয়াছে। যেমন, চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ কমাইতে সোনার আমদানি কমাইবার কথা বলা হইয়াছে, পেট্রোলিয়াম পণ্যের মূল্য বাজার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার কথা আছে। রাজকোষ ঘাটতির পরিমাণকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৪.৮ শতাংশে বাঁধিবার প্রতিশ্রুতিও আছে। কোন সদিচ্ছা কতখানি রূপায়িত হয়, তাহাই দেখিবার।

অর্থনৈতিক সমীক্ষায় অনুমান, আগামী অর্থবর্ষে আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ হইতে ৬.৭ শতাংশের মধ্যে থাকিবে। বর্তমানের পাঁচ শতাংশ হারের কথা স্মরণে রাখিলে অনুমানটি প্রবল আশাবাদী। স্পষ্টতই হিসাবটি সর্বাধিক ইতিবাচক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কষা হইয়াছে, যেখানে বর্ষা স্বাভাবিক হইবে, বিনিয়োগের ধারাটি সুস্থায়ী থাকিবে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ইতর-বিশেষ ঘটিবে না, দেশেও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত থাকিবে। আশাবাদ ভাল— তবে দেশের বাজারে বিদেশি বিনিয়োগের বান ডাকিবে, এমন আশা বিপজ্জনক। আর্থিক বৃদ্ধির হার সাড়ে ছয় শতাংশের ঘরে লইয়া যাইতে হইলে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়াইতেই হইবে। বিনিয়োগকারীদের ঋণে সরকার যাহাতে ভাগ না বসায়, তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে। রাজকোষ ঘাটতির হার কমাইতে হইবে। সরকারের রাজস্ব নীতি সংযত না হইলে দেশীয় বিনিয়োগ বাড়িবার প্রত্যাশা না করাই ভাল। বাজেটে সংযমের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইবে কি?

এই বাজেটে অর্থমন্ত্রীর একটি দায়বদ্ধতা আছে— খাদ্যের নিরাপত্তা আইনের জন্য তাঁহাকে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করিতেই হইবে। সেই টাকা জোগাইবে কে? এখনও পর্যন্ত আভাস, মনমোহন সিংহের সরকার টাকা জোগাইবার একটি পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে— পেট্রোলিয়াম এবং আংশিক ভাবে সারের ভর্তুকি রদ করিয়া সেই টাকা খাদ্য নিরাপত্তা বিলের খাতে ব্যয় করা। আজকের বাজেট যদি সত্যই এই পথে হাঁটে, তবে তাহা বহু মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ হইবে। প্রথমত, পেট্রোলিয়াম এবং সারের ভর্তুকির সিংহভাগ যাঁহারা ভোগ করেন, তাঁহারা কোনও যুক্তিতেই ভর্তুকির দাবিদার হইতে পারেন না। সেই ভর্তুকি রদ করা এক অর্থে সামাজিক ন্যায়বিধান। দ্বিতীয়ত, ডিজেলের দাম বাজার-নির্ধারিত হইলে চলতি খাতে ঘাটতির উপরও একটি সুপ্রভাব পড়িবে, যদিও তাহার মাত্রা লইয়া প্রশ্ন আছে। তৃতীয়ত, একটি (অন্যায্য) খাতে ভর্তুকি ছাঁটিয়া আর একটি (তুলনায় ন্যায্য) খাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করায় রাজকোষের উপর অপেক্ষাকৃত কম চাপ পড়িবে।

রেল বাজেট এবং আর্থিক সমীক্ষা মিলাইলে আশা করা চলে, আজকের বাজেটটির তার জনতোষণে বাঁধা থাকিবে না। কিন্তু নির্বাচনের আগে শেষ বাজেটটি কি রাজনীতির ছাপহীন হওয়া আদৌ সম্ভব? তাহার প্রয়োজনও নাই। মনমোহন সিংহ-সনিয়া গাঁধীরা সম্ভবত ইতিবাচক রাজনীতির পথ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহারা বুঝিয়াছেন, শহরাঞ্চলে কংগ্রেসের ভোট কার্যত নাই হইয়া গিয়াছে। লড়িতে হইলে তাঁহাদের ভরসা গ্রাম। সেই গ্রামে ডিজেলের দাম বাড়িলে যতখানি কুপ্রভাব পড়িবে, চাল-গম সস্তায় পাওয়া গেলে তাহার সুপ্রভাব অনেক বেশি। ফলে, পাঁচটি জিনিসে ভর্তুকি ছড়াইয়া রাখিবার পরিবর্তে তাঁহারা খাদ্য নিরাপত্তাকেই পাখির চোখ করিয়াছেন। তাহাতে রাজনীতিও বাঁচিল, অর্থনীতিও মরিল না। সংস্কারের সহিত রাজনীতির আপাত জল-অচল সম্পর্কটি ভাঙিবার এই পথটি যদি বাজেটে গুরুত্ব পায়, ভাল।

কেন সরকার

চলচ্চিত্রকার ও সেন্সর বোর্ড: এই দুই পক্ষের চিরশত্রু-সম্পর্ক। শিল্পী চাহেন, স্বাধীনতার সীমারেখা যত দূর সম্ভব প্রসারিত করিতে। আর সেন্সর বোর্ড কাঁচি হাতে মুখাইয়া থাকে, সমাজের শুভাশুভের বিপুল ভার নিজস্কন্ধে লইয়া। ইহার পর যখন দ্বন্দ্বসম্পর্কে আরও একটি অক্ষ যুক্ত হয়, রাজনীতির অক্ষ, তখন তো আর কথা নাই। এই মুহূর্তে সুমন মুখোপাধ্যায় নির্মিত চলচ্চিত্র 'কাঙাল মালসাট' সেন্সর বোর্ডে আটকাইয়া যাওয়ার ফলে বাঙালি সংস্কৃতি ও রাজনীতি লইয়া বিস্তর জলঘোলা হইতেছে। এই ঘোলা জলের উপরে উঠিয়া শ্বাস লইতে চাহিলে একটি মৌলিকতর বিষয়ে প্রণিধান আবশ্যক। তাহা হইল, চলচ্চিত্র-বিচারের সার্টিফিকেশন বোর্ড-এ সরকারের নিয়ন্ত্রণ আদৌ কেন থাকিবে? সরাসরি, প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, কোনও ভাবেই এই নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তাইতে পারে না। প্রথমত ইহা অনধিকার চর্চা, যাহার যাহা কাজ নহে সেই কাজে হস্তক্ষেপ। দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক আদর্শও বলে, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শৈল্পিক স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রিক ছড়ির শাসন গ্রহণযোগ্য নহে।

চলচ্চিত্রটিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়াছে সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই আঞ্চলিক বোর্ডগুলিতে কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা থাকেন না, সদস্য মনোনয়ন করে রাজ্য সরকারগুলিও। কোন সরকার কতখানি অধিকার ফলাইবে, তাহা অবশ্যই নির্ভর করে সরকারি সক্রিয়তার প্রাবল্যের উপর। কিন্তু যে ভাবে এই বোর্ড তৈরি হয়, তাহাতে বুঝা সম্ভব, সরকারি হস্তক্ষেপের কারণেই হউক, আর সদস্যদের বিষয়গত অজ্ঞতা ও সংবেদনশীলতার অভাববশতই হউক, সেন্সরশিপের নিরপেক্ষতার আশা অলীক বলিলেই চলে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, সেন্সরশিপের কাজ যদি রাষ্ট্রের তরফে সরকারি প্রতিনিধিরা না করেন, তবে কে করিবেন। প্রশ্নটি জরুরি, কেননা গণতান্ত্রিক দেশে যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা একটি অবশ্যমান্য নীতি, সামাজিক সুরক্ষার খাতিরে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিও সর্বথা ফেলনা নয়। তবে প্রশ্নটির যুক্তিমান্য উত্তর সম্ভব। সমস্যার মৌলিক সমাধান চাহিলে নিয়ন্ত্রক-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই আগাপাশতলা নূতন ভাবে গড়া দরকার। সরকারি গণ্ডির বাহিরে বিষয়-বিশেষজ্ঞ যাঁহারা, তাঁহারাই নিয়ন্ত্রণের হাল ধরুন। দেশের সংবিধান আছে, আইন আছে, সেই অনুযায়ী বিচক্ষণ বিশেষজ্ঞরাই না হয় বিচার করুন, কোন্ চলচ্চিত্রে কী বলা হইতেছে। বিচক্ষণ কে বা কাহারা, তাহা নির্ধারণ করা বাস্তবে কঠিন কোনও কাজ নহে। এমন ব্যক্তিরই এই ধরনেরই দায়িত্বে থাকা উচিত, যাঁহার উৎকর্ষ সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন উঠিবে না। তাহার পাশাপাশি আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। কোনও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষত যুক্ত যাঁহারা, তাঁহারা সচরাচর নিজ ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বাধীনতাই চাহিয়া আসেন। চলচ্চিত্র-শিল্পে যুক্ত মানুষরাও চলচ্চিত্রের জন্য অধিকতর মুক্তি চাহিবেন, ইহাই প্রত্যাশিত। বাস্তবে বিপরীতটিই ঘটিতে দেখা গেল। কে জানে, বর্তমান সদস্যদের শৈল্পিক দায় অপেক্ষা রাজনীতির দায়টি হয়তো গুরুতর।

জমির ব্যাপারে সরকারকে থাকতেই হয়

পুলিশ আর ক্যাডার নিয়ে গিয়ে গায়ের জোরে জমি কেড়ে নেওয়াটা নিশ্চয়ই অন্যায়। কিন্তু সেটাই তো সরকারের একমাত্র সম্ভাব্য ভূমিকা নয়। একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ অর্থনীতির শিক্ষক মৈত্রীশ ঘটক। *দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব।*

'... **সূচ্যগ্র মেদিনী।**' সিঙ্গুর, ২০০৬। *ছবি: অমিত দত্ত*

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ বিলের মূল বক্তব্য, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বাড়ালেই বিনা বাধায় অধিগ্রহণ করা সম্ভব হবে। আপনার কথা মানলে বলতে হয়, তাতে বিপরীত ফল হতে পারে। ('শিল্প নেই...', *সাক্ষাৎকার, প্রথম পর্ব,* ২৭-০২) আবার, নগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় চক্রবর্তী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, ভারতে জমির দাম গোটা দুনিয়ার মাপকাঠিতেই খুব চড়া। কাজেই জমির দাম আরও বাড়লে শিল্পায়ন কার্যত অসম্ভব হবে। জমি অধিগ্রহণের আর কোনও উপায় আছে, যেখানে সব দিক বজায় রেখে শিল্পের জন্য জমি পাওয়া সম্ভব?

এটা ঠিকই যে জমির দাম একটা সীমার বেশি হয়ে গেলে শিল্পস্থাপন আর সম্ভব হবে না। আবার সরকার কম দামে জোর করে জমি অধিগ্রহণ করে শিল্প তৈরি করবে, সেটাও কাম্য নয়। তা ছাড়া, আগেই বলেছি যে জমির মূল্য এক এক জন কৃষকের কাছে এক এক রকম। ফলে ক্ষতিপূরণের যথাযথ অঙ্ক নির্ধারণ করা কঠিন। তবে মধ্যপন্থা যে নেই, তা নয়। আমি এবং দিল্লি স্কুল অব ইকনমিকস-এর অধ্যাপক পরীক্ষিৎ ঘোষ একটা বিকল্প মডেলের কথা বলেছিলাম— নিলামের মাধ্যমে জমির দাম স্থির করা। বিভিন্ন পঞ্চায়েত শিল্পের জন্য জমি দেওয়ার প্রস্তাব করবে, এবং একটি ন্যূনতম দাম স্থির করে দেবে। এ বার শিল্পমহল তাদের সামনে থাকা সবক'টি প্রস্তাব থেকে সবচেয়ে পছন্দসই জায়গা বেছে নেবে এবং যে শিল্পগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশি দাম দিতে রাজি হবে, তারাই জমি পাবে। এতে পুরো প্রক্রিয়াটা উল্টে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ রতন টাটা একটা জমি বেছে নিলেন এবং তার পর ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক হাজার ঝামেলা আরম্ভ হল— এই পথে না গিয়ে যারা ইচ্ছুক (সেই কারণেই জমি বেচার প্রস্তাব পাঠাবে পঞ্চায়েত), তাদের মধ্যে থেকে জমি বেছে নেওয়া হল। এতে এক দফা ঝামেলা কমবে।

এর পর বেছে নেওয়া পঞ্চায়েতটি প্রত্যেক জমির মালিককে তার মনোমত দর দিতে বলবে। ধরা যাক, শিল্পের জন্য হাজার একর জমি চাই। গ্রামে দু'হাজার মানুষের মাথাপিছু এক একর করে মোট দু'হাজার একর জমি রয়েছে। দু'হাজার জনই দর জমা দেবেন। সেই দরকে যদি কম থেকে বেশি, এ ভাবে সাজানো হয়, তবে প্রথম এক হাজার জনের জমি কেনা হবে। অর্থাৎ সবচেয়ে কম দামে যে এক হাজার একর জমি পাওয়া যাবে, সেটাই কিনে নেবে পঞ্চায়েত। এই এক হাজার জনের চেয়ে যাঁরা বেশি দর দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যাঁর দর সবচেয়ে কম, অর্থাৎ তালিকায় যিনি ১০০১তম, তিনি যে দরে জমি বেচতে চেয়েছিলেন, সেই দর দেওয়া হবে আগের ১০০০ জনকে। মানে, যত লোকের জমি কেনা হল, তাঁদের প্রত্যেকে যে দাম চেয়েছিলেন, তার চেয়ে বেশি দাম পেলেন।

কিন্তু যে হাজার জন জমি বেচলেন, তাঁদের জমি যে পাশাপাশিই হবে, তেমন তো নয়। মাঝখানে 'অনিচ্ছুক' চাষির জমিও থাকতে পারে। এ বার শিল্পের জন্য যে এক হাজার একর প্রয়োজন, তাকে চিহ্নিত করে দেওয়া হল। সেই সীমানার মধ্যে কিছু জমি ইতিমধ্যেই কিনে নেওয়া হয়েছে, কিছু জমি হয়নি। আবার, সীমানার বাইরে যত জমি পড়ে থাকল, তারও কিছুটা কেনা, কিছুটা নয়। এ বার, সীমানার মধ্যে যে অনিচ্ছুকরা আছেন, তাঁদের সীমানার বাইরে অধিগৃহীত জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হল। যেহেতু একই গ্রামের, একই চরিত্রের জমি, তাঁদের আপত্তির কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকবে না। এই পুনর্বাসনের প্রক্রিয়াটি শেষ হলেই সীমানার মধ্যে সব জমি ফাঁকা— সেখানে শিল্প হবে। সীমানার বাইরে অনিচ্ছুকরা নিজেদের জমি নিয়ে থাকবেন। আর যাঁরা জমি বেচে দিয়েছেন, তাঁরা তো নিজেদের পছন্দের চেয়ে বেশি দরই পেলেন। এই পদ্ধতিতে অশান্তি ছাড়াই শিল্পের জমি পাওয়া সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু বার বার বলছেন, শিল্পোদ্যোগীদের নিজেদের প্রয়োজনীয় জমি নিজেদের জোগাড় করে নিতে হবে। অর্থাৎ, তিনি কোনও মতেই শিল্পের জমি অধিগ্রহণের মধ্যে থাকবেন না।

এই কথাটার সঙ্গে একেবারেই একমত নই। হ্যাঁ, পুলিশ আর ক্যাডার নিয়ে গিয়ে গায়ের জোরে জমি কেড়ে নেওয়াটা অন্যায়। সেটা কখনও না করা ভাল। কিন্তু সেটাই তো সরকারের একমাত্র সম্ভাব্য ভূমিকা নয়। বস্তুত, সরকারের মূল দায়িত্ব হল যাতে বাজারে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক লেনদেন হতে পারে, তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। মানুষ যাতে জমির ওপর ক্রমশ কম নির্ভর করে ভাল ভাবে বাঁচতে পারেন, তার বন্দোবস্ত করা। ধরা যাক, কোনও এক চাষি জমি বিক্রি করে হাতে টাকা পেলেন। তিনি সেই টাকা কোথায় রাখবেন? গ্রামে ব্যাঙ্কের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে, এটিএম বানাতে হবে। এগুলোর পরিকাঠামো সরকারকেই তৈরি করে দিতে হবে। ভারত যদি হংকং হত, তা হলে সরকার দায় ঝেড়ে ফেলতে পারত, সেখানে প্রায় সব কাজই বেসরকারি সংস্থা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমানবন্দর তৈরির মতো প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকার জমি অধিগ্রহণ করে, শিল্পের জন্য জমি সংশ্লিষ্ট সংস্থাই কিনে নেয়। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে সে দেশে জমির বাজার ঠিকঠাক কাজ করে বলে। আমাদের এখানে সরকার কোনও মতেই নিজের দায়িত্ব এড়াতে পারে না।

সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি ছাড়া জমিজমার ক্ষেত্রে কোনও লেনদেন কি সম্ভব? হাজার সরকারি নিয়ম আছে জমি বা বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে (যেমন চাষের জমির ক্ষেত্রে বর্গা আইন)। তাই বাজারে কেনাবেচা হলেও, সরকার বা প্রশাসনের কোনও ভূমিকা থাকবে না, এটা বলা যায় না। আর শিল্পের ক্ষেত্রে সমস্যা তো শুধু জমির পরিমাণ নিয়ে নয়, পরিবহণ-বিদ্যুৎ ইত্যাদি পরিকাঠামো বিষয়ে সরকারের ভূমিকা আছে। তাই সরকারের কোনও ভূমিকা থাকবে না, এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া, জমির মাফিয়াদের কবল থেকে ক্ষুদ্র কৃষিজীবীদের বাঁচাতে এবং বড় সংস্থার সঙ্গে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে সরকার যদি কৃষকের পক্ষে থাকে, সেটা মানুষের জন্য খুব জরুরি। জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে, বা জমি বিক্রির পর হাতের টাকা রাখার ক্ষেত্রে যে প্রতিষ্ঠানগুলো জরুরি, সেগুলো ঠিক ভাবে রাখার, চালানোর দায়িত্ব সরকারের। বাজারকে সাহায্য করার, বাজারের পরিসর বাড়ানোর দায়িত্ব সরকারের। সে দায়িত্ব না নিলে সাধারণ মানুষই সমস্যায় পড়বেন।

জমির মাফিয়াদের কবল থেকে ক্ষুদ্র কৃষিজীবীদের বাঁচাতে এবং বড় সংস্থার সঙ্গে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে সরকার যদি কৃষকের পক্ষে থাকে, সেটা মানুষের জন্য খুব জরুরি।

সাক্ষাৎকার: অমিতাভ গুপ্ত

শাসকের স্বভাব যায়নি, বিদ্বজ্জনও তথৈবচ

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

অসহিষ্ণুতা আমাদের রাজ্যে পুরনো এবং পরিচিত ব্যাধি। যখনই কেউ বেচাল কথাবার্তা বলেছেন বা ক্ষমতাবানদের পক্ষে অস্বস্তিকর কোনও কাজ করেছেন, বরাবর এবং বার বার তাঁদের দমনের ব্যবস্থা হয়েছে।

সুমন মুখোপাধ্যায়ের একটি চলচ্চিত্রের তিন-চারটি অংশ নিয়ে প্রশ্ন তুলে সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশন-এর আঞ্চলিক বিভাগ ছাড়পত্র আটকাতে চাইছে। অনেকেরই মনে হচ্ছে, এ কাজ 'গণতন্ত্রবিরোধী'। কেন মনে হয়েছে? একটি দৃষ্টান্ত। ওই ছবিতে দেখা গেছে, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান এক জন বিতৃষ্ণার চোখে দেখছেন। এটাই নাকি বোর্ডের আপত্তির অন্যতম কারণ। প্রতিবাদীদের যুক্তি, এ আপত্তি অগণতান্ত্রিক; কেউ যদি 'পরিবর্তন'-এ উল্লসিত না হয়, সেটা তার অধিকার, তা দেখানো যাবে না কেন?

ঠিক কথা। এমন একটা গণতান্ত্রিক, খোলামেলা যুক্তির পরিসর থাকলে সত্যিই বড় ভাল হত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, সেই পরিসরটা এ দেশে প্রায় সর্বত্রই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। দৃষ্টান্ত চাইলে বলব, দয়া করে জয়পুরে আশিস নন্দীর ঘটনাটা এক বার ঝালিয়ে নিন। কিংবা মনে করুন সলমন রুশদির কলকাতায় (না) আসার কাহিনি।

অন্য রাজ্যের কথা থাক। পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক কালে অসহিষ্ণুতার নানা নজির নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, অভিযোগের তর্জনী উঠেছে শাসকদের দিকে। সেটা অস্বাভাবিক নয়, অন্যায়ও নয়। কিন্তু একই সঙ্গে একটা কথা খেয়াল করা দরকার। অসহিষ্ণুতা আমাদের রাজ্যে পুরনো এবং পরিচিত ব্যাধি। যখনই কেউ বেচাল কথাবার্তা বলেছেন বা ক্ষমতাবানদের পক্ষে অস্বস্তিকর কোনও কাজ করেছেন, বরাবর এবং বার বার তাঁদের দমনের ব্যবস্থা হয়েছে। কখনও প্রিভেনটিভ ডিটেনশন আইন কাজে লাগিয়ে, কখনও ভারত রক্ষা আইন বা ডি আই আর, কখনও বা এসমা কিংবা মিসা। কখনও আবার নিজ দলের বিদ্বজ্জনকে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করায় উৎসাহিত করে সমস্ত বিরুদ্ধতা সবলে উপড়ে ফেলবার চেষ্টা চলেছে।

অর্ধ শতাব্দী পিছিয়ে যাওয়া যাক। বাষট্টিতে চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় প্রবল এবং অনিয়ন্ত্রিত উৎসাহে পীত-জাতিদ্বেষের আবহাওয়া তৈরি করা হচ্ছে, সেই উন্মাদনার বিরুদ্ধে যুক্তির কথা বললেই ভারত রক্ষা আইনে গ্রেফতার। কার্টুন এঁকে দেখানো হচ্ছে: চিনারা শূকরের মতো বংশবৃদ্ধি করে। এই অশালীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেই আপনি চিহ্নিত হবেন দেশদ্রোহী বলে। দুয়ো দেবে সতীর্থরা। নিমেষে চেনা মুখ অচেনা হয়ে যাবে।

আবার, ষাটের দশকের মধ্যভাগে উৎপল দত্তের 'কল্লোল' নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপা বন্ধ করে দিয়েছিল অনেক সংবাদমাধ্যম। অধিকাংশই না-হয় 'বুর্জোয়া সংবাদপত্র'। কিন্তু সি পি এমের মুখপত্র দেশহিতৈষী-ও এদের সঙ্গে জুটল কেন? না, উৎপল নকশালবাড়ির সমর্থনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, নকশালদের সঙ্গ করছেন। আবার, নকশালদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হওয়ার পর তারা 'বিশ্বাসঘাতক' উৎপলের 'মানুষের অধিকারে' প্রযোজনাটিকে আক্রমণ করে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একটি নিবন্ধ ছাপল 'দেশব্রতী'তে। ওই, গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু উৎপল তথা তাঁর দল এল টি জি যখন এর উত্তর দিল, ছাপা হল না দেশব্রতী-তে। গণতন্ত্র?

অথবা সেই দিনের ঘটনাও মনে করা যাক। ২৬ অগস্ট ১৯৭৪। 'দুঃস্বপ্নের নগরী' প্রযোজনার জন্য স্টার থিয়েটারে উৎপল দত্ত, তাপস সেন-সহ তাঁদের দলের অন্যান্যরা শারীরিক ভাবে আক্রান্ত হলেন। ১১ সেপ্টেম্বর 'দেশ' পত্রিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (সনাতন পাঠক) লিখেছিলেন, 'এ কি ফ্যাসিবাদের পূর্বলক্ষণ? তাই যদি হয়, তা হলে আর গণতন্ত্রের বুলি আউড়ে লাভ কী?'

এই 'গণতান্ত্রিক' অধিকারটি আসলে কেমন, বলে দিয়েছিলেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কাছে গিয়েছিল প্রতিবাদী বিদ্বজ্জনদের প্রতিনিধি দল। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বলেছিলেন, 'মঞ্চকে তোমরা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত করলে জনতার একাংশের অভ্যুত্থান হতে পারে সেই রাজনীতির বিরুদ্ধে।'

এর পরে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারও মোটামুটি এই বচন মেনেই সংস্কৃতি শাসন করে গিয়েছে। কেউ পছন্দের না হলেই তাকে জায়গা দেওয়া হয়নি। কণ্ঠ স্তব্ধ করা হয়েছে। কোনও বামমার্গী বুদ্ধিমানের সাহায্যে চালানো হয়েছে পরোক্ষ উৎপীড়ন। সে সব কাহিনি বহুচর্চিত। যুক্তিবাদীরা রবীন্দ্রনাথের বলা কথার মধ্যে সে দিনের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন, 'আমি যখন প্রশ্ন করতে যাই, বিচার করতে যাই, আমার হিতৈষীরা ব্যাকুল হয়ে আমার মুখ চাপা দিয়ে বলেন, আজ তুমি কিছু বোলো না। দেশের হাওয়ায় আজ প্রবল একটা উৎপীড়ন আছে— সে লাঠি-সড়কির উৎপীড়ন নয়, তার চেয়ে ভয়ংকর সে অলক্ষ্য উৎপীড়ন... কেবল বাধ্যতাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে। কার কাছে বাধ্যতা। মন্ত্রের কাছে, অন্ধবিশ্বাসের কাছে।' *(সত্যের আহ্বান, কালান্তর)।*

সেই ধারা পালটায়নি, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শাসনক্ষমতায় এসে এমন মান্যতা উৎপাদনের ধারাই বজায় রাখছে। তবে, তাদের ব্যবস্থাটি, আশিস নন্দীকে ধার করে বলতে হয়, পূর্বতনদের মতো মসৃণ নয়, সে জন্যই সতত নজর কাড়ে।

অথচ, সুষ্ঠু শাসনের স্বার্থে, সমাজের বাঁধন দৃঢ় রাখার স্বার্থেই ভিন্ন সুর শোনা অতীব প্রয়োজন। তা ছাড়া, তাতে সমস্যাই বা কী? নিজেদের কার্যক্রমের যুক্তিতে যদি সত্য থাকে, বিজ্ঞান থাকে, তা হলে বিরুদ্ধ যুক্তি শুনতে আপত্তি কেন? যুক্তিতে যদি ধার থাকে, তবে তাকে আতুপুতু করে রাখতে হবে কেন? ভ্রান্ত যুক্তিকে পরাজিত করে ঠিক পন্থা জয়ী হবেই। আর, যদি ভুল থাকে কোথাও, সে ভুল সংশোধন করে নিলে তো শাসকের বা তাঁর অনুগামীদের ভাবমূর্তি একটুও ম্লান হয় না, বরং উজ্জ্বল হয়।

ভিন্ন সুর কান পেতে শুনলে, তা প্রকাশিত হতে দিলে দেশের ও দশের মঙ্গল। এমন বুঝেই মাও জে দং বলেছেন, কমিউনিস্টদের সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে হবে, কারণ সত্য জনতার স্বার্থ দেখে। ১৯৫৮, ২২ মার্চ চেংড়ু সম্মেলনে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের বলেন, 'যা বলার আছে মুক্তকণ্ঠে বল। সুবিধাবাদী বলে চিহ্নিত হতে, কাজ থেকে ছাঁটাই হতে, পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হতে, স্ত্রী কর্তৃক পরিত্যক্ত হতে (ও জনসাধারণের নিন্দাভাজন হতে), রাষ্ট্র দ্বারা নির্যাতিত হতে বা ফাঁসির কাঠে ঝুলতে ভয় পেয়ো না। কোনও কিছুকেই ভয় কোরো না।' পরের বছর লুসান সম্মেলনে এই কথারই পুনরাবৃত্তি— 'যা বলার আছে বলো। আমার মধ্যে যদি দোষ দেখ, তা হলে আমাকে সংশোধন করো। নির্ভীক হও।' মত প্রকাশের এই গণতান্ত্রিক পরিসর তৈরি করে দেওয়ার ফলে মাও জে দঙের গরিমা কমেনি, বেড়েছে।

কিন্তু আমাদের রাজ্যের তথা দেশের শাসকরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও কাজে উল্টোটা করে থাকেন। এবং, ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে রাজ্যের তথা দেশের অন্য অনেক শাসকের মতোই তৃণমূলও চেয়েছে নিজেদের 'পণ্ডিত', যারা তার হয়ে স্তোত্র রচনা করবে। ক্ষমতায় এসে এখন তারাও চাইছে প্রশ্নহীন আনুগত্য, সেই চাহিদা না মিটলেই শাসকের অসহিষ্ণুতা প্রকট হচ্ছে, বস্তুত বাড়ছে।

ক্ষমতা এ-রকমই। সে চায় নিজেকে নিরঙ্কুশ করতে। আর সেখানেই গণতান্ত্রিকতার লড়াই। গণতান্ত্রিক পরিসরটি কোনও নাড়ু নয় যে হাত ঘোরালেই শাসক টুপ করে তা হাতে দিয়ে দেবে। স্বেদ-তিতিক্ষার বিনিময়ে গণতান্ত্রিক পরিসর তৈরি করবার আন্দোলনটি শুরু করতে হবে সৎ সাহসী বিদ্বজ্জনদের। আশিস নন্দীর বক্তব্য পছন্দ না হলে তাঁর যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি শানাও, সলমন রুশদির কথাবার্তার চালাকি ভাল না লাগলে তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষের ভাষা তুমিও আয়ত্ত করো, সুমনের ছবির বিদ্রুপের ভঙ্গি ভাল না লাগলে তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তি দাঁড় করাও। স্তালিনের প্রতি আক্রমণের যুক্তি পছন্দ না হয়, অসুবিধে কোথায়? তাকে প্রকাশিত হতে দেওয়া হোক। (স্তালিন বেচারি তো এখন রাম-শ্যাম-যদু— যে কোনও লোকের ঢিলের লক্ষ্য!) স্তালিনের পক্ষে দাঁড়িয়ে হাজার একটা কথা বলাই যায়। সে যুক্তি তুলে ধরো তুমিও। তুমুল তর্ক চলুক, কিন্তু গায়ের জোরে অধিকার আদায়ের চেষ্টা কেন?

গোলমালটা এখানেই। বিদ্বজ্জনদের উচিত ছিল স্বধর্মে সুস্থিত থেকে সমবেত ভাবে সরকারকে চাপ দেওয়া, যাতে তারা গণতান্ত্রিক পরিসরটিকে নষ্ট করতে না পারে। তার বদলে তাঁরা পরস্পরকে বুদ্ধিহীন আক্রমণ করে চলেছেন। এ রাজ্যের যে বিদ্বজ্জনেরা বাম জমানার অবসান ঘটাতে তৎপর হয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই আজ নির্ভেজাল অন্যায়ের সামনে মৌন অবলম্বন করেছেন। অনতিঅতীতে যেমন মৌনী ছিলেন পরে-সরব-হয়ে-ওঠা কিছু বিদ্বজ্জন। তাঁরা তখন বাম জমানার অন্যায় দেখলেও জিভ কেটে পালাবার চেষ্টা করতেন, রা কাড়তেন না। এক জনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনাদের মন্ত্রী এমন উদ্ধত ভঙ্গিতে কথা বলছেন বা এ রকম অশালীন ভঙ্গি করছেন, এর প্রতিবাদ করছেন না কেন? তিনি বললেন, তার আগে দেখতে হবে, আমার প্রতিবাদ কার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে! ক্ষমতাসীনদের আড়াল করার চেষ্টায় মাননীয় বুদ্ধিমানেরা যে-সব কথা সে দিন বলেছেন, তারই পুনরাবৃত্তি করছেন আজকের বুদ্ধিমানেরা।

এ এক ধরনের আত্মরতি। নিজের অধীত জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও। এর ফলেই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়। ক্রমশ দূরে সরে যায় গণতান্ত্রিক পরিসর গড়ার স্বপ্ন।

তৃণমূল কংগ্রেস এমন মান্যতা উৎপাদনের ধারাই বজায় রাখছে। তবে, তাদের ব্যবস্থাটি, আশিস নন্দীর কথা ধার করে বলতে হয়, পূর্বতনদের মতো মসৃণ নয়, সে জন্যই সতত নজর কাড়ে।

শিল্পী: সুমন চৌধুরী

সম্পাদক সমীপেষু

শকুন নেই, মুখ্যমন্ত্রী জানেন না?

পাহাড়ে উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, উৎসব না তো কি মানুষের শ্রাদ্ধ করব, শকুনের ভাগাড় তৈরি করব? এটা অতীব পরিতাপের যে, শকুন সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কোনও ধারণাই নেই। এখন ভাগাড় আছে কিন্তু সেখানে শকুন আসে না। শকুন উধাও তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। গবাদি পশুকে যে ওষুধ দিয়ে বাঁচানোর চেষ্টা হয়েছিল, তার দাপটে শকুন কুল শেষ। ক'বছর আগে এই কপিঞ্জল কুলকে ফিরিয়ে আনার জন্য ব্রিটিশ সরকার রাজস্থান সরকারকে অর্থ দিয়েছিল। সেই উদ্ধারের কাজ কতটা এগিয়েছে জানা নেই। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য শকুনের এ দেশে আসা অত্যন্ত দরকার।

সঞ্জয় চৌধুরী। *ইন্দা, খড়্গপুর*

'সংলাপ' চাই, কিন্তু বলপ্রয়োগও জরুরি

■ শিবাজীপ্রতিম বসুর মতে কাশ্মীরে ভারতের সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীর হাতে 'বহু মানুষ প্রাণ হারান বা নির্যাতনের শিকার হন।' ('কেন কাশ্মীরের মানুষ...', ১৪-২) এ বিষয়ে আলোচনা করার আগে এ ব্যাপারে অন্যান্য দেশের কার্যধারা কী রকম, তা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে তার অন্যতম উদাহরণ চেচনিয়া ও ইঙ্গুসেটিয়া অঞ্চলে রুশ বাহিনীর আচরণ। ইরাকে কুর্দ বিচ্ছিন্নতাকামীদের উপরে সাদ্দাম হোসেন এবং তাঁর আত্মীয় 'কেমিক্যাল আলি' বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করেছিলেন। বোমাও ফেলেছিলেন। শ্রীলঙ্কার তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে সরকার নিরন্তর যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত তাদের পরাভূত করেছে। আপসের নামও মুখে আনেনি। পাকিস্তানের অতীতে পাখতুন এবং বর্তমানে বালুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে পঞ্জাবি আধিপত্যের সরকার নির্মম অত্যাচার চালিয়েছে। যুক্তরাজ্য থেকে বিচ্ছিন্নতাকামী উত্তর আয়ারল্যান্ডের ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের উপরেও অত্যাচার হয়েছে। সম্ভবত পৃথিবীতে ইদানীং রক্তপাতহীন ভাবে বিচ্ছিন্নতার মোকাবিলা করা হয়েছে একমাত্র কানাডার কোয়েবেক প্রদেশে।

বিচ্ছিন্নতাবাদের মোকাবিলা বাংলাদেশ করেছে এক বিচিত্র উপায়ে। চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ প্রধানত চাকমা-বৌদ্ধ ছিলেন। জিয়াউর রহমানের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় চট্টগ্রামের সমতল থেকে বাঙালি মুসলমানদের উৎসাহ দেওয়া হয়, পার্বত্য অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করার জন্য। এবং অচিরেই বৌদ্ধ-চাকমা জনজাতিরা সেখানে সংখ্যালঘুতে পরিণত হন।

এর সঙ্গে কাশ্মীরে ভারতের আচরণ তুলনীয়। শেখ আবদুল্লার চাপাচাপিতে এবং নেহরুর সম্মতিতে ভারতের অন্য কোনও অঞ্চলের মানুষের কাশ্মীরে গিয়ে জমি কিনে বসবাস করার অনুমতি তো নেই-ই, এমনকী জম্মু অঞ্চলের মানুষও কাশ্মীর উপত্যকায় জমি কিনতে পারবে না। এর প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিরাট আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। কিন্তু শেখ আবদুল্লার প্রতি নেহরুর ভক্তি নড়েনি। কেউ যুক্তি দিতে পারেন, ভারতের আচরণই মানবিক, কিন্তু 'রিয়েলপলিটিক্স' কী বলে? বাংলাদেশে চাকমা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের দম বেরিয়ে গেছে। আর ভারতে আমরা কোথায় আছি, তা আমরা সবাই জানি।

শিবাজীপ্রতিম লিখেছেন, "এই প্রেক্ষিতে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা তাঁদের ভিটেমাটি ছেড়ে জম্মুর সমতলে নেমে আসতে থাকেন।" বাস্তব হচ্ছে, তাঁদের খুন করে, ভয় দেখিয়ে, পশুর মতো খুঁচিয়ে তাড়ানো হয়।

কিছু 'ব্লিডিং হার্ট' রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দাবি করছেন, 'যারা রাষ্ট্রের বাইরে যেতে চাইছে তাদের সঙ্গে প্রকৃত সংলাপ' করতে হবে! হ্যাঁ, সংলাপ করতে হবেই। কিন্তু আগে রাষ্ট্রের বলের সম্যক পরিচয় তাদের টের পাইয়ে দিয়ে তবেই। তা ছাড়া সংলাপ সদর্থক হবে না। কারণ, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা দুর্বল রাষ্ট্রকে খাতির করবে না। আর এই বলপ্রয়োগ করতে গিয়ে যদি কিছু ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ঘটে, তার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু বলপ্রয়োগে এক মুহূর্তের জন্যও ভাটা পড়লে চলবে না।

তথাগত রায়। *কলকাতা-৭৩*